গবেষণা অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ
(Abstract)

ভূমিকা

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক ছিল ওতপ্রোত। প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠা মানুষ তার কবল থেকে নিজেদের উদ্ধারের জন্য প্রকৃতির বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক রূপকেই দেব-দেবী হিসাবে বিশ্বাস করতে লাগল। তার ফলে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত নিম্নশ্রেণীর মানুষদের মধ্যে ধীরে ধীরে দেবদেবীর রূপ পেতে লাগল। সেই দিক থেকে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মনসামঙ্গল কাব্যের সর্প দেবী মনসা এবং চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দেবী চণ্ডী অশুভ অসুরনাশিনী বরাভয়দাত্রী হিসেবে স্থান পেল। তবে এই দেবদেবীরা কাব্যে স্থান পাওয়ার আগে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত ব্রতকথায় প্রাধান্য পেয়েছিল। মঙ্গলকাব্যগুলিতে সেই ব্রতকথার দেবদেবীর সঙ্গে পুরাণের দেবদেবী ভাবনা যুক্ত হল। মঙ্গলকাব্যগুলির দেবদেবী এই লৌকিক ও পৌরাণিক দেবীভাবনার মিশ্রিতরূপ। মধ্যযুগের এই মঙ্গলকাব্যের ধারায় প্রথম সৃষ্টি মনসামঙ্গল কাব্য। তার পাশাপাশি এল চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল ইত্যাদি। তবে ষোড়শ শতাব্দীতে সৃষ্টি চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের গুরুত্ব সেক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এই কাব্যটিতে একই সঙ্গে 'মার্কণ্ডেয়পুরাণ'-এর চণ্ডী ও লৌকিক চণ্ডীর আচরণের সংমিশ্রণ ঘটেছে। দেবীর পূজা প্রচারে প্রকল্পেই তার আত্মপ্রতিষ্ঠার আকূতি। সেক্ষেত্রে একদিকে যেমন তার বিশালাকৃতি স্বরূপ-মহিমা প্রকাশের প্রয়োজন হয়েছে। তেমনি তাকে ভক্তের বিপদে মাতৃসূলভ কল্যাণমূর্তিতে আবির্ভাব হতে দেখা গেছে। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবী চণ্ডীর দুটি স্বরূপের মাহাত্ম্যগীত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

মধ্যযুগের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য সৃষ্টির প্রেক্ষাপট

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যের ধারায় এই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে উদ্ভবের প্রেক্ষাপট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সময় কবিরা সমাজের প্রয়োজনে কাব্য লিখতেন। সেই দিক থেকে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলি সমকালীন সমাজের দর্পণ। ভারতবর্ষের ইতিহাসে আর্য এবং তুর্কী আগমন মঙ্গলকাব্যের উপাদানগুলি ঘনীভূত হতে সাহায্য করেছিল। আর্যরা যে সমাজকে চারটি বর্ণে ভাগ করেছিল সেই বর্ণভেদ থেকে সর্বনিম্ন বর্ণটি উচ্চবর্ণের কাছ থেকে ধীরে ধীরে অবহেলায় দূরে সরে যেতে থাকে। তার ফলে মৌর্য বংশ থেকে শুরু করে সেনবংশ পর্যন্ত ভারতবর্ষে স্পষ্ট দুটি সংস্কৃতির রূপ পাওয়া গেল। এর মধ্যে উচ্চশ্রেণীর মানুষরা পৌরাণিক সংস্কৃতির এবং নিম্নশ্রেণীর মানুষরা লৌকিক সংস্কৃতির ধারক ও বাহকে পরিণত হল। উচ্চশ্রেণীর দেবতা পুরুষ প্রধান এবং

নিম্নশ্রেণীর দেবতা নারী প্রধান। তখন নিম্নশ্রেণীর মানুষ তাদের ব্রতকথা, লোকবিশ্বাস-সংস্কারগুলিতে দেবদেবী মাহাত্ম্য ও স্বরূপ মৌখিক আকারে বহন করত। আর উচ্চবর্ণের রচিত পুরাণের দেবতাদের মাহাত্ম্য-গীত নানা উপায়ে বলা হত। এমন সময় বাংলা ঘটে যার অপর একটি বহিরাগমন। সেটা হল তুর্কী অভিযান (সম্ভবত ১২০২-০৩)। এই বিভাষী, বিধর্মী, বিসংস্কৃতির মানুষের আক্রমণে উচ্চবর্ণের সংস্কৃতির সঙ্গে নিম্নবর্ণের সংস্কৃতি মিলনের প্রয়োজন দেখা গেল। তার ফলে উভয় সংস্কৃতির মিশ্রণে মঙ্গলকাব্যগুলি সমকালীন প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠল। তার মধ্যে পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রথম মনসামঙ্গল কাব্যের উদ্ভব হল। তবে দেবী মনসা ক্রূর ও হিংস্র হওয়ায় ষোড়শ শতাব্দীতে মানুষ নতুন এক দেবীর প্রয়োজন অনুভব করল। যে দেবী একদিকে হবে বিশাল প্রকৃতির ও অন্যদিকে হবে বরাভয়দাত্রী কল্যাণময়ী মাতৃরূপিনী। সে হল দেবী চণ্ডী। তাই ষোড়শ শতাব্দীর সামাজিক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক, ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে চণ্ডীমঙ্গলকাব্য সৃষ্টির প্রয়োজন দেখা দিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানিক দত্ত : কবি কথা

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রথম কবি বলে মনে করা হয় মানিক দত্তকে। তিনি উত্তরবঙ্গের কবি এবং তাঁর বাসস্থান গৌড়ের অদূরে উত্তরে নঘরিয়া গ্রামে। তাঁর কাব্যের বিভিন্ন স্থান নাম, গৌড়ের সংস্কৃতি, ধর্মীয় প্রভাব ও মালদহ জেলার বিভিন্ন আদমশুমারির ভিত্তিতে তা দেখাতে চেষ্টা করা হয়েছে। তাঁর উল্লেখ প্রথম আমরা পাই মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে। সেই দিক থেকে শুধু নয় কাব্যের বিভিন্ন তথ্য ও সমালোচকদের মন্তব্যের ভিত্তিতে তাঁর কাব্যের রচনাকাল ১৪৯৫-১৫৯৫ সালের মাঝামাঝি অনুমান করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল : কাহিনী গ্রন্থনারীতি

মধ্যযুগের কাব্যগুলি আখ্যানধর্মী। তার কাহিনী গ্রন্থনার নিজস্ব রীতি ছিল। মঙ্গলকাব্য রচনার রীতি বিষয় বিন্যাসের ক্রম হল বন্দনা, গ্রন্থোৎপত্তির কারণ, সৃষ্টি রহস্য, মনুর জীব সৃষ্টি, হর-গৌরীর দাম্পত্য জীবন, অভিশাপ, বারমাস্যা, চৌতিশা , নারীগণের পতিনিন্দা, বিবাহাচার ও সর্বশেষে চরিত্রদের স্বর্গে প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি। কাহিনী বিন্যাসের এই রীতি কতটা প্লট গঠনের নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছে তার পুঙ্ক্ষাণুপুঙ্ক্ষ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সে ক্ষেত্রে দেখা গেছে, মানিক দত্ত উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গল কাব্যধারার মত করে তাঁর চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের সূচনা করেছেন

সৃষ্টিতত্ত্ব দ্বারা। তাঁর কাব্যের সেই সৃষ্টিপত্তনে বৌদ্ধশূন্যবাদ এবং বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার ছাপ সুস্পষ্ট। তিনি কাব্যটি ব্রতকথার উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য করে কাহিনী বর্ণনা শুরু ও সমাপ্ত ঘটিয়েছেন। এমনকি ব্যাধ ও ধনপতি খণ্ডের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্কও নিবিড়। আর দেবখণ্ড বলে আলাদা কোন খণ্ড তার কাব্যে বর্ণিত হয়নি। তাই তাঁর কাব্যটিকে অখণ্ড কাব্য বলা যেতে পারে। কাব্যের প্রথম দিকে তথা দেবখণ্ডের বর্ণনায় কবি এমন বহু পুরাণের ঘটনা সংযোগ ঘটিয়েছেন, যা কাহিনী গ্রন্থনায় সঠিক সম্ভাব্যতা ও কার্যকারণ সূত্রের সন্নিবেশ হয়নি। প্রথম কবি হওয়ায় এবং গায়েন স্বভাবের জন্য তাঁর কাব্যের লক্ষ্য ছিল দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্যকে যথাসাধ্য প্রতিষ্ঠা দেওয়া। শিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তির মত রসজ্ঞ পাঠকের প্রতি তাঁর নজর ছিল না। তাঁর নজর ছিল ভক্তের ভক্তির উপর। তবে উপকাহিনী বর্ণনায় কবি বাস্তব জীবনাভিজ্ঞতার পরিচয় রেখেছেন। ভক্তকূলের দিকে নজর রাখতে গিয়ে তাঁর বলার ভঙ্গি হয়েছে প্রায় গদ্যাকার ও গল্প বলার মত। কাব্যটি তথ্যমূলক। রামভক্তিবাদ, লোকবিশ্বাস ও অলৌকিকতা এই সকল হয়েছে কাব্যটির চালিকা শক্তি। কবি যেখানে দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্য কথা বর্ণনা করেছেন সেখানে গ্রন্থনার দিকটি অনেকটাই আড়ষ্ঠ হয়ে পড়েছে। সমকালীন মানুষের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে কবি কাব্যের গ্রন্থনা করেছেন। এই সকল কারণে তাঁর কাব্যের কাহিনী গ্রন্থনা অধিকাংশ স্থলে শিথিল। পাঠক বা ভক্তের কাছে নতুন দেবীর মাহাত্ম্য-বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্যই তাঁর কাব্যটি লিখিত হয়েছে। এই কাব্যের প্রত্যেকটি চরিত্র দেবী চণ্ডীর ব্রতের দাস। তবে বাস্তব তথ্যের উদ্‌ঘাটনে তাঁর অবস্থান সর্বাগ্রে। রোমান্টিক কবি পরিচয়েও তাঁর স্বাক্ষর রয়েছে। প্লট গঠনের রীতিও তিনি সমগ্রকাব্যে লঙ্ঘন করেছেন-- তা নয়। যে সকল দিকগুলি প্লট ও মঙ্গলকাব্যের গঠন অনুযায়ী পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল ঃ চরিত্র নির্মাণ

মানিক দত্তের চরিত্রগুলিকে বিশ্লেষণের আগে চরিত্রের শ্রেণী বিভাজন করা হয়েছে। সেই দিক থেকে তাঁর কাব্যের প্রথম ও প্রধান নারী দেবীর চরিত্র চণ্ডীর বিশ্লেষণে এসেছি। সেক্ষেত্রে চণ্ডীর আদি উৎস থেকে ক্রমবিবর্তনের দিকটি কীভাবে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে পরিলক্ষিত হল তার পরিস্ফূট হয়েছে। সেক্ষেত্রে দেখা গেছে, মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের চণ্ডী পৌরাণিক স্বরূপের পাশাপাশি লৌকিক স্বভাবেরও পরিচয় দিয়েছে। তাঁর কাব্যে দেবী চণ্ডীকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া অন্যান্য চরিত্রগুলি অনেকটাই নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। তবে কালকেতু চরিত্রটি ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। এমনকি নারদ ও পদ্মা সহচর চরিত্র হওয়া সত্ত্বেও এই কাব্যে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। মানিক দত্তের ফুল্লরা, খুল্লনা, লহনা, ধনপতি, শ্রীমন্ত এই প্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে কেউ গ্রাম্য স্বভাবের, কেউবা নারী মনস্তত্ত্বে উজ্জ্বল, কেউবা নিজস্ব আভিজাত্য ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দীর্ঘ পরম্পরার ধারক।

তবে তার কাব্যে অপ্রধান চরিত্রগুলি কোন আদর্শের প্রতিনিধি নয়। তারা নিজস্ব পরিচয়ে ভাস্বর। ফুল্লরার মাসীমা, পুরাই দত্ত, দাসী দুর্বলা, বশীকরণে লীলাবতী, মাতা রম্ভাবতী ইত্যাদি চরিত্রগুলি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তাঁর কাব্যে এমন বহু অপ্রধান চরিত্র রয়েছে যারা তাদের স্বল্প চারিত্রকগুণেই সমাজ বাস্তবতাকে ক্ষণিকের জন্য সকলের মুখোমুখি করে তুলেছে। মানিক দত্ত তাঁর অভিজ্ঞতায় কত বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছেন এবং তাদের ক্ষেত্রে কতটা নিজস্বতা রক্ষা করতে পেরেছেন সেই দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মূল্যায়ন

মনসামঙ্গল কাব্য মঙ্গলকাব্যের ধারায় আদি সৃষ্টি। মনসামঙ্গলের পর একজন শক্তিদেবী বা লৌকিক দেবীকে কেন্দ্র করে অপর একটি মঙ্গলকাব্যের ধারার সূচনা হল। সেই শক্তিরূপিনী দেবী চণ্ডী এবং তাকে নিয়ে রচিত কাব্যের নাম চণ্ডীমঙ্গল। এই ধারার প্রথম কবি মনে করা হয় মানিক দত্তকে। তিনি চণ্ডীমঙ্গল কাব্য নামে নতুন একটি মঙ্গলকাব্য ধারার সৃষ্টি করেছিলেন, তা বললে অত্যুক্তি হবে না। মানিক দত্তের সম্বন্ধে একথা মনে রাখা সর্বত্রই প্রয়োজন যে তিনি অল্প শিক্ষিত, এমনকি অন্যান্যদের মত রাজসভার কবি নন। তিনি একজন গায়েন কবি। তাঁর সামনে ছিল সাধারণ অল্প শিক্ষিত, লোক বিশ্বাসে আশ্রিত মাটির সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত মানুষ। তাদের মানস প্রবণতা অনুযায়ী তিনি এই কাব্যটি লিখেছেন। উপরন্তু তাঁর সামনে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কোন স্ট্রাকচার ছিল না। কিন্তু তাঁর পূর্বে মনসাদেবীকে নিয়ে মনসামঙ্গল কাব্যের গঠনরীতি তৈরী হয়েছিল। তিনি মনসামঙ্গলের গঠন রীতিকে সামনে রেখে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের মঙ্গলকাব্যের ধারার সৃষ্টি করেছেন। এটাই তাঁর মূল্যায়নের মূল কথা। তিনি যে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের গঠন রীতির খসড়া তৈরী করেছিলেন সেখানেই তাঁর কৃতিত্ব। তাই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রথম কাঠামো গঠনে তাঁর স্বতন্ত্রতা নয়, বরং তাঁর কৃতিত্বের দিকটাই বড় হয়ে উঠেছে।

উপসংহার

মানিক দত্ত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রথম কবি। তাঁর কাব্যের আলোচনায় বিভিন্ন অধ্যায় বিভাজনের মধ্য দিয়ে কবি কৃতিত্বের দিকটি উঠে এসেছে। মধ্যযুগের বাংলা তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের গুরুত্ব ও স্থান কোথায় তা নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়েছে।